2 উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

ওর

রনৈতিক গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

উদারনৈতিক গণতন্ত্র বলতে এমন একটি সংকীর্ণতামুক্ত আদর্শকে বোঝায় যেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়টিও সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীকে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রারম্ভিক কাল হিসেবে গণ্য করা হয়। এই গণতান্ত্রিক ধারণাটি ছিল সনাতন উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ধারণা। সাধারণভাবে ধরা হয় যে, জন স্টুয়ার্ট মিলের পূর্ববর্তী সময়ে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের দার্শনিকরা যে গণতন্ত্রের প্রচার করেন তা সাবেকি গণতান্ত্রিক রীতি নামে পরিচিত। কিন্তু জন স্টুয়ার্ট মিলের পরবর্তীকালে প্রচারিত গণতন্ত্রকে বলা হয় আধুনিক গণতান্ত্রিক রীতি। ফাইনার উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে 'শর্তাধীন গণতন্ত্র' বলেছেন। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

[1] **রাজনৈতিক সাম্যকে গুরুত্বদান:** উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হল রাজনৈতিক সাম্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা। এই ধরনের গণতন্ত্রে সংবিধানও গণতান্ত্রিক ধরনের হয়ে থাকে। কারণ আপামর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা সংবিধান দ্বারাই সম্ভব। গণতান্ত্রিক সংবিধানে স্বীকৃত হয় জাতিধর্মবর্ণ, নারী-পুরুষ বা ধনী-দরিদ্রের সমান অধিকার। এই ধরনের গণতন্ত্রে প্রাপ্তবয়স্ক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভোটে যে সরকার গঠিত হয় সেই সরকারকে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার বলা যায় না। সেই সরকার নিয়োজিত থাকে সকল ব্যক্তির কল্যাণে।

[2] **শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তন:** উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সরকার হল সকল জনগণের জন্য নিয়োজিত সরকার। যার কাজ হল সকলের কল্যাণসাধন। কিন্তু সরকার জনকল্যাণবিরোধী কোনো কাজ করলে জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে সেই সরকারের পরিবর্তন করে নতুন সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এই পরিবর্তনের জন্য কোনোরূপ বিপ্লব বা হিংসাত্মক পথ অবলম্বনের প্রয়োজন নেই। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সরকার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিপ্লব ও হিংসার পথকে সমালোচনা করা হয়।

[3] **সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনব্যবস্থা:** উদারনৈতিক গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। আইনসভা, কমিটি ব্যবস্থা, ক্যাবিনেট বা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা—সকলের পিছনেই রয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন। এরূপ গণতন্ত্রে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোনো প্রতিনিধির স্থান নেই। এই ধরনের গণতন্ত্রে জাতি, নারী-পুরুষ, বর্ণ, জন্মস্থান, ধর্ম, সম্পত্তির মালিকানা, এমনকি শিক্ষাগ্রহণ সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও কোনোপ্রকার বৈষম্য থাকে না।

[4] **সংখ্যালঘুর অধিকারের স্বীকৃতি:** উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুর অধিকারকে মেনে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যাতে জাতিগত, বর্ণগত, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি দিক থেকে বঞ্চিত না হয় তারজন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আইনগত বা সাংবিধানিকভাবে তাদের বিভিন্ন প্রকার অধিকার প্রদান করা হয়েছে এবং একইসঙ্গে সেইসব অধিকারকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এইভাবে সংখ্যালঘুর স্বার্থকে সংরক্ষণ করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাফল্য নিয়ে এসেছে।

[5] **শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য:** উদারনৈতিক গণতন্ত্র ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতিতে সরকারের তিনটি বিভাগের কথা বলা হয়েছে। যথা—[1] শাসন বিভাগ, [2] আইন বিভাগ এবং [3] বিচার বিভাগ। এই তিনটি বিভাগ পৃথক থেকে কাজ করে। সরকারের এই তিনটি বিভাগের কাজ শাসনতন্ত্রে নির্দিষ্ট করা থাকে। আবার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাজের তালিকা শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ থাকে। তা ছাড়া নাগরিকের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত থাকে। এইসব কারণে উদারনৈতিক গণতন্ত্রে শাসনতন্ত্র হল একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

[6] **নিরপেক্ষ আদালতের প্রাধান্য:** উদারনৈতিক গণতন্ত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে নিরপেক্ষ আদালতের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এই আদালতের দুটি কাজ উল্লেখযোগ্য। যথা—[1] নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করা এবং [2] সংবিধানের রক্ষাকর্তা ও ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে কাজ করা। এ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের, কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের অথবা একাধিক রাজ্যের ও কেন্দ্রের বিভিন্ন বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ আদালতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া নিরপেক্ষ আদালত সামাজিক পরিবর্তনের দিকে গুরুত্ব দিয়ে আইন বিভাগকে প্রভাবিত করতে পারে।

[7] **ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা:** উদারনৈতিক গণতন্ত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আইনের অনুশাসনের নীতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে এক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেমন—[1] আইনের দৃষ্টিতে প্রত্যেকে সমান, [2] আইনের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষণ।

[8] **ভোটদানের স্বীকৃতি:** উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। জাতিধর্মবর্ণ ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সকল মানুষই ভোটদানের অধিকারটি ভোগ করেন।

সমালোচনা

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের তত্ত্বটি বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে। এই তত্ত্বের সমালোচকরা মনে করেন যে, সাধারণ জনগণের মধ্যে এখানে যে রাজনৈতিক সাম্যের কথা বলা হয়েছে বাস্তবে তা ঠিক নয়। কারণ বাস্তবে সমাজে এলিটরাই রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করে। তা ছাড়া উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে কোনো কোনো সমালোচক অবাস্তব বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এই ধরনের গণতন্ত্রে ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে যে কথা বলা হয় তা কল্পবাদী চিন্তাধারার দ্বারা আচ্ছন্ন। একে বাস্তবায়নের মতো কোনোরূপ ব্যবস্থা নেই। হেনরি মেইন বলেছেন, এই ধরনের গণতন্ত্রের বিশেষ স্থায়িত্ব নেই। তা ছাড়া এরূপ ব্যবস্থায় পরস্পরবিরোধী স্বার্থদ্বন্দ্ব বিরাজমান।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

...তান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস্ যে সমাজবিকাশের নিয়মসমূহ আবিষ্কার করেছেন, তার মধ্যে মানব ও মানবজাতির পক্ষে সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহের বিজ্ঞানসম্মত বিষয়সমূহ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তাঁদের মতে কেবল ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ সাধন করে এবং গণমালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া সক্রিয় করা সম্ভব। মার্কসবাদ অনুসারে সমাজতন্ত্র পুঁজিতন্ত্রকে নিজে থেকেই বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে উৎখাত করতে পারে না। কেবল বিষয়গত নিয়মাবলির কার্যকারিতাই পুঁজিতন্ত্রের পতন ঘটায় না। পুঁজিতন্ত্রের পতনের জন্য বিষয়ীগত শর্তসমূহের ক্রিয়াশীলতাও বিদ্যমান থাকে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ হল—

[1] **অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যপ্রতিষ্ঠা:** সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সাম্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা মনে করেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য বা বৈষম্য থাকলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেবল সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্যপ্রতিষ্ঠার কথা বলে সাম্যের সুফল পাওয়া সম্ভব নয়।

[2] **ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান:** সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসানের কথা বলা হয়েছে। কারণ উৎপাদনের উপাদানসমূহের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকলে সমাজ শ্রেণিশোষণ মুক্ত হবে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির আধিক্যই এই বৈষম্যকে বাঁচিয়ে রাখে। সমাজে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত থাকলে সম্পদের সুষম ও ন্যায়সংগত বণ্টন সম্ভব হয় না। তাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটিয়ে সম্পদের সুষম ও ন্যায়সংগত বণ্টনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

[3] **জনগণের সার্বভৌমিকতার বাস্তবায়ন:** সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্পিত হয় বলে জনগণের সার্বভৌমিকতার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। এই ধরনের ব্যবস্থায় জাতিধর্মবর্ণ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মুষ্টিমেয় বাছাই করা মানুষের শাসন এখানে থাকে না বলে জনগণের রাজনৈতিক চেতনাও বৃদ্ধি পায়।

[4] **সামাজিক ন্যায়সৃজন:** বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র শ্রেণিহীন সমাজের কথা বলে। এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়ের ওপর। এই সমাজ হয়ে ওঠে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক। এই সমাজ মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণমুক্তির সমাজ। সমাজতন্ত্রে—[1] জমির ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটানোর কথা বলা হয়, [2] শ্রেণিস্বার্থের বিলোপসাধন দ্বারা এমন এক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেখানে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ববিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করে।

[5] **ধনতন্ত্রের জোয়াল থেকে মুক্তি:** ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃতি হল উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার উপস্থিতি, ফলে শ্রমিক তার ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রের এই জোয়াল থেকে ব্যক্তিকে মুক্তি দেয়। ব্যক্তিমালিকানা থেকে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাকে মুক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করে সামাজিক মালিকানা। ফলে শ্রমিক শ্রেণি বঞ্চনা থেকে মুক্ত হয়।

[6] **শ্রেণিহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা:** সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রেণিবৈষম্যের বিলোপসাধনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করে সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধরনের রাষ্ট্র হল এক অভিনব রাষ্ট্র—যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষ নিজেরাই শাসনব্যবস্থা কায়েম করে এবং নিজেদের স্বার্থেই তা পরিচালিত হয়। এই রাষ্ট্র সাম্যভিত্তিক সমাজগঠনের দিকে অগ্রসর হয়।

[7] **গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা প্রতিষ্ঠা:** সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিকে গুরুত্ব সহকারে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজব্যবস্থাকে সচেতন করা হয়। বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে দুটি পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার মিশ্রণ বলে মনে করা হয়। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 'গণতন্ত্র' ও 'কেন্দ্রিকতা' বিষয় দুটি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

[8] **একদলীয় ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ:** উদারনৈতিক গণতন্ত্রে তথা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের কথা বলা হয়। কারণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থকগণ মনে করেন এরূপ গণতন্ত্রে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির তথা সর্বহারা শ্রেণির স্বার্থের মধ্যে কোনোরূপ পৃথকত্ব থাকে না। অভিন্ন স্বার্থসম্পন্ন হওয়ার জন্য একটি রাজনৈতিক দলের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

[9] **সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা:** সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবক্তারা মনে করেন যে, বুর্জোয়া শাসনের অবসানের পর প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে কার্যত শ্রমিক শ্রেণিই ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং তারা সংখ্যাগুরু শ্রেণি হওয়ার জন্য সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে নতুন ধরনের একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য প্রচারিত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অবসানের পর সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনই প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্বাধীনে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র হল প্রকৃত গণতন্ত্র।

উপসংহার: উপসংহারে বলা যায়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতির কোনো গুরুত্ব নেই। এরূপ গণতন্ত্রে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ পৃথক বা স্বতন্ত্রভাবে থেকে কাজ করে না। বরং বিভাগগুলির মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা সহযোগিতার নীতি কায়েম করে এরূপ রাষ্ট্র পরিচালনা করে।

প্রশ্ন 4 কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর একটি টীকা লেখো।
অথবা, কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

উত্তর

কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা গণতন্ত্রের বিপরীত ব্যবস্থা। এরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারের জনগণের কাছে কোনোরূপ দায়িত্বশীলতা থাকে না। তা ছাড়া রাজনৈতিক দল, স্বার্থগোষ্ঠী বা গণমাধ্যমসমূহ প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির কোনো স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা থাকে না। কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয় প্রভৃতিকেও অস্বীকৃত বলা যায়। এই ব্যবস্থায় জনমত বলে কিছু থাকে না। এই ব্যবস্থাকে তাই অনেকে Totalitarian System বা সর্বাত্মক ব্যবস্থার অনুপন্থী বলে উল্লেখ করেছেন। কর্তৃত্ববাদী (Authoritarian) রাজনৈতিক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

[1] এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একজন বা কয়েক জন মাত্র ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে। সাধারণ জনগণ এই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাদের কোনোরূপ রাজনৈতিক ভূমিকাও থাকে না। সকল ধরনের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ স্তব্ধ করে দেওয়ার সকল প্রচেষ্টা শাসকগোষ্ঠী চালিয়ে যায়।

[2] কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোনো রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে না। তবে কোনো কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি মাত্র দলের অস্তিত্ব দেখা যায়। অবশ্য এই দল নেতার প্রতি বা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জোগানোর কাজ করে। এই ব্যবস্থায় নেতা বা ওই নির্দিষ্ট রাজনৈতিক

শক্তি আইনগত কর্তৃত্বের স্বাভাবিক প্রয়োগ করতে পারে।' এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার কয়েকটি উদাহরণ হল—যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, সুইডেন, গণপ্রজাতন্ত্রী চিন, নিউজিল্যান্ড, ইটালি প্রভৃতি।

ককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার এইসব সংজ্ঞা থেকে এই ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায়। এরূপ ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—

[1] **কেন্দ্রের প্রাধান্য:** এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যপরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারই হল সর্বেসর্বা। তবে কখনো-কখনো প্রশাসনিক সুবিধার জন্য আঞ্চলিক সরকার গঠন করলেও ওই আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতা, স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। আঞ্চলিক সরকারগুলি কোনোরূপ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার যেসব দায়িত্ব আঞ্চলিক সরকারের হাতে তুলে দেয়, আঞ্চলিক সরকার কেবল সেইসব দায়িত্বই পালন করে।

[2] **সংবিধানের প্রাধান্যহীনতা:** এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য থাকে না। যুক্তরাষ্ট্রে যেমন কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির ক্ষমতা সংবিধানের দ্বারা বণ্টিত হয় এবং এই ব্যাপারে কেন্দ্র ও এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে কোনো বিরোধ সংঘটিত হলে বিচার বিভাগ সেইসব বিরোধের নিষ্পত্তি করে, এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় সেরূপ হয় না। এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য থাকে না বলে বিচার বিভাগও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। তা ছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা বণ্টিত না হওয়ায় কোনো বিরোধেরও সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই বিরোধ মীমাংসার জন্য বিচার বিভাগেরও কোনো প্রাধান্য থাকে না।

[3] **লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের প্রাধান্য:** এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় সংবিধান লিখিত বা অলিখিত যে-কোনো প্রকার হতে পারে। যেমন—ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী চিন প্রভৃতি দেশের সংবিধান প্রধানত লিখিত। অপরদিকে, যুক্তরাজ্যের সংবিধান প্রধানত অলিখিত। তবে এরূপ ব্যবস্থায় সংবিধান লিখিত হলেও অলিখিত বিষয়ও বিশেষ প্রাধান্য পায়।

[4] **সংবিধানের সুপরিবর্তনীয়তা:** এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সংবিধান সুপরিবর্তনীয় প্রকৃতিসম্পন্ন হয়। এরূপ ব্যবস্থায় সংবিধান খুব সহজেই পরিবর্তন করা যায়। অর্থাৎ এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় সংবিধানের প্রকৃতি দুষ্পরিবর্তনীয় না হওয়ায় সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে সহজেই সংবিধান সংশোধন করা সম্ভব। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে কোনো 'বিশেষ পদ্ধতি' ব্যবহার করা হয় না।

[5] **দুর্বল বিচার বিভাগ:** এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য না থাকায় সংবিধানের রক্ষাকর্তা ও ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে বিচার বিভাগের কোনোরূপ ভূমিকা থাকে না। আবার বিচার বিভাগ এরূপ ব্যবস্থায় দুর্বল প্রকৃতিসম্পন্ন হওয়ার কারণে তা কার্যত আইন বিভাগের অধস্তন হিসেবে কাজ করে।

[6] **কেন্দ্রীয় আইনসভার কর্তৃত্ব:** এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনসভা সার্বিক ক্ষমতা ভোগ করে বলে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। এরূপ ব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য স্থাপিত হয় না। কেন্দ্রীয় আইনসভা তার ক্ষমতাবলে যে-কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারে, বাতিল করতে পারে এবং সংশোধন করতে পারে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইনসভা আইন প্রণয়ন, বাতিল ও সংশোধনের ক্ষেত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যেহেতু এরূপ শাসনব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকে না, সেহেতু কেন্দ্রীয় আইনসভা তার ইচ্ছামতো সংবিধান সংশোধন করে থাকে।

[7] **একনাগরিকত্ব:** এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় নাগরিকরা যেহেতু একটি মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্যের অধীন এবং এখানে যেহেতু কোনো আঞ্চলিক ব্যবস্থার প্রাধান্য থাকে না, সেহেতু এখানে নাগরিকদের একটি মাত্র নাগরিকত্ব বিদ্যমান। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, চিন প্রভৃতি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাগরিকদের একটি মাত্র নাগরিকত্ব বিদ্যমান। এখানে আঞ্চলিক নাগরিকত্ব থাকে না।

উপসংহার: এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধানত দুটি রূপ লক্ষ করা যায়। একটি হল উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সরকার বা শাসনব্যবস্থা। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের শাসনব্যবস্থা।

প্রশ্ন 6 যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ? যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো। 3+7

উত্তর

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

ক্ষমতাবণ্টনের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বা সরকারকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—[1] এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বা সরকার এবং [2] যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বা সরকার। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার বিপরীত হল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কোনো সর্বসম্মত সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিক এর বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন।

ডাইসি প্রদত্ত সংজ্ঞা: যুক্তরাষ্ট্র বলতে এমন এক ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে জাতীয় ঐক্য ও শক্তির সঙ্গে অঙ্গরাজ্যগুলির অধিকারের সামঞ্জস্যসাধনের রাজনৈতিক উপায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

মঁতেস্কু প্রদত্ত সংজ্ঞা: যুক্তরাষ্ট্র বলতে এমন এক চুক্তিকে বোঝায়, যার দ্বারা কতকগুলি রাষ্ট্র একটি বৃহত্তর রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ফাইনার প্রদত্ত সংজ্ঞা: যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে আঞ্চলিক সরকারগুলি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বপ্রয়োগের একটি অংশ ভোগ করে এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির সম্মতি দ্বারা গঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বাকি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বসমূহ ন্যস্ত থাকে।

কে সি হোয়ার প্রদত্ত সংজ্ঞা: যুক্তরাষ্ট্র বলতে এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে সমগ্র দেশের সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে সংবিধান দ্বারা ক্ষমতা বণ্টিত হয় এবং উভয় ধরনের সরকার তাদের নিজ নিজ এক্তিয়ারাধীনে ক্ষমতায় লিপ্ত থাকে।

এ এইচ বার্চ প্রদত্ত সংজ্ঞা: যুক্তরাষ্ট্র বলতে এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে একটি সাধারণ সরকার ও কিছু আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে এমনভাবে ক্ষমতা বণ্টিত হয় যার দ্বারা উভয় ধরনের সরকার তাদের নিজ নিজ এলাকায় পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে এবং তাদের প্রত্যেকে নিজ প্রতিনিধির দ্বারা জনগণকে শাসন করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি উদাহরণ হল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইটজারল্যান্ড, কানাডা, ভারত প্রভৃতি।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলি আলোচনা করলে এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। এগুলি হল—

[1] **দুই ধরনের সরকারের অস্তিত্ব:** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দুই ধরনের সরকার বিদ্যমান। যথা—[a] কেন্দ্রীয় সরকার এবং [b] আঞ্চলিক সরকার। এই দুই ধরনের সরকারের দুই ধরনের মনোভাব

পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার জন্য সমগ্র দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং আঞ্চলিক সরকারগুলি নিজ নিজ অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করে আঞ্চলিক স্বার্থ বজায় রাখার চেষ্টা করে।

[2] **ক্ষমতার বণ্টন:** যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধান দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার কী কী ক্ষমতা ভোগ করবে এবং আঞ্চলিক সরকারসমূহ কোন্ কোন্ ক্ষমতার অধিকারী প্রভৃতি সংবিধান অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। এ ব্যাপারে উভয় সরকারকেই সংবিধানের নির্দেশ মেনে চলতে হয়। জাতীয়স্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন—বৈদেশিক নীতি, প্রতিরক্ষা, মুদ্রাব্যবস্থা প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং কৃষি, জলসেচ, স্থানীয় শান্তিরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আঞ্চলিক সরকারের হাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

[3] **লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের অস্তিত্ব:** যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধান লিখিত হয়। তা না হলে কোন্ সরকারের ক্ষমতার এক্তিয়ার কতখানি তা বোঝা দুষ্কর হয়ে উঠবে এবং উভয় প্রকার সরকারের মধ্যে বিরোধ দেখা দেবে। আবার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান শুধু লিখিত হলেই চলে না, একে দুষ্পরিবর্তনীয়ও হতে হয়। সংবিধান নমনীয় বা সুপরিবর্তনীয় হলে উভয় প্রকার সরকারই নিজ নিজ স্বার্থপূরণের জন্য প্রয়োজনমতো সংবিধান সংশোধন করে নিতে পারে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সাংবিধানিক দিক থেকে অচলাবস্থা দেখা দেবে। এই কারণে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হয়।

[4] **সংবিধানের প্রাধান্য:** যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধান হল সরকারি ক্ষমতার উৎস। কারণ সংবিধানেই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা বণ্টন করা থাকে। সংবিধানে স্বীকৃত ক্ষমতা অনুসারেই উভয় ধরনের সরকার তাদের ক্ষমতা ভোগ করে। এই কারণে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। যদি সংবিধানে ক্ষমতাবণ্টনের বিষয়টি লিপিবদ্ধ না থাকত তাহলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বিরোধ অনিবার্য হয়ে পড়ত। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে রাজ্য সরকারগুলির স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করত।

[5] **নিরপেক্ষ আদালতের অবস্থিতি:** যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতের অবস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এরূপ শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতাবণ্টনের ব্যাপারে কোনো বিরোধ দেখা দিতে পারে। এই বিরোধের মীমাংসা করে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। তা ছাড়া সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও রক্ষাকর্তা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

[6] **দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা:** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা হয়। আইনসভার নিম্ন কক্ষটি গঠিত হয় দেশের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে। কিন্তু উচ্চকক্ষের সদস্যরা প্রতিটি রাজ্য থেকে সমানুপাতিক হারে নির্বাচিত হন।

[7] **দ্বিনাগরিকত্ব:** যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দুই ধরনের নাগরিকত্ব বিদ্যমান। একজন নাগরিক প্রথমে সমগ্র দেশের নাগরিক এবং সে আবার নিজ অঙ্গরাজ্যের নাগরিক। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দুই ধরনের সরকারের অবস্থিতি থাকার জন্য নাগরিকরা দুই ধরনের সরকারের কাছেই আনুগত্য দেখায়। এই ধরনের ব্যবস্থাকে বলা হয় দ্বৈতনাগরিকত্ব।

উপসংহার: যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রধানত দুই প্রকারের হতে পারে। যথা—[1] উদারনৈতিক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। এর প্রধান উদাহরণ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং [2] সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। এর প্রধান উদাহরণ হল পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন।

7 একককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্যগুলি উল্লেখ করো।

উত্তর

...কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পার্থক্য

যে শাসনব্যবস্থায় সরকারের যাবতীয় ক্ষমতা একটি মাত্র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ একটি মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে, সেই শাসনব্যবস্থাকে বলা হয় এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা। অপরদিকে, যে শাসনব্যবস্থায় একটি সাধারণ সরকার ও কতকগুলি আঞ্চলিক সরকার বর্তমান এবং সংবিধান উভয় ধরনের সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেয়, সেই শাসনব্যবস্থাকে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে যেসব পার্থক্য লক্ষ করা যায় তা হল—

[1] **কাঠামো সংক্রান্ত পার্থক্য:** এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় দেশের সকল প্রকার শাসনকার্য কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করে। কেন্দ্রীয় সরকার তার কাজের সুবিধার জন্য কতকগুলি আঞ্চলিক সরকার গঠন করতে পারে। কিন্তু এইসব আঞ্চলিক সরকারের কোনোরূপ স্বাধীনতা থাকে না। কেন্দ্রীয় সরকারকর্তৃক অর্পিত ক্ষমতার বাইরে আঞ্চলিক সরকারের কোনো স্বাধীনতা নেই।

অপরদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দুই ধরনের সরকার বিদ্যমান থাকে। যথা—কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার। উভয়ের দায়িত্ব বিপরীতমুখী। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার ব্যাপারে সংবিধানে বর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে। কিন্তু আঞ্চলিক সরকারগুলি নিজ নিজ অঞ্চলের স্বার্থ- রক্ষার ব্যাপারে কাজ করে।

[2] **ক্ষমতা সংক্রান্ত পার্থক্য:** এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশের সার্বিক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার তার নিজের কাজের সুবিধার জন্য আঞ্চলিক সরকার গঠন করে তাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে। তবে সেইসব ক্ষমতাকে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণও করতে পারে।

অপরদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সংবিধান দ্বারা ক্ষমতা বণ্টিত হয়। সংবিধানে কেন্দ্রের হাতে যেসব বিষয়গুলি রাখা হয় সেগুলি জাতীয় স্বার্থ বিষয়ক আর আঞ্চলিক সরকারের হাতে যেসব বিষয় রাখা হয় সেগুলি আঞ্চলিক স্বার্থ বিষয়ক।

[3] **সংবিধানের প্রাধান্য সংক্রান্ত পার্থক্য:** এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য থাকে না। কেন্দ্রীয় আইনসভাই সেখানে সর্বেসর্বা হিসেবে কাজ করে, অর্থাৎ এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রাধান্য বজায় থাকে। এই আইনসভা আইন প্রণয়ন করতে পারে, তা বাতিল করতে পারে এবং প্রয়োজন হলে তা সংশোধনও করতে পারে।

অপরদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক—দুই ধরনের সরকারের ক্ষমতার উৎস হল সংবিধান। সংবিধানবহির্ভূত কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার কোনো সরকারের নেই।

[4] **সংবিধানের প্রকৃতি সংক্রান্ত পার্থক্য:** এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সংবিধান লিখিত হতে পারে, আবার অলিখিতও হতে পারে। যেসব রাষ্ট্রে সংবিধান লিখিত সেইসব সংবিধান সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যায়। আর্থাৎ সংবিধানের প্রকৃতি হয় সুপরিবর্তনীয়।

অপরদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান হয় প্রধানত লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়। কারণ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতাবণ্টনের কথা সংবিধানে লিখিত থাকে। সংবিধান হল উভয়প্রকার সরকারের ক্ষমতার উৎস। এরূপ সংবিধান সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যায় না বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা এরূপ সংবিধান পরিবর্তন করা যায়। এই পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ

সরকার অর্থাৎ উভয়প্রকার সরকারেরই সম্মতি প্রয়োজন হয়। কোনো সরকারই এককভাবে সংবিধান সংশোধন করতে পারে না।

[5] **আদালতের গুরুত্ব সংক্রান্ত পার্থক্য:** এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভার প্রাধান্য বিদ্যমান। আইনসভাই সর্বেসর্বা। এখানে সংবিধানের কোনো প্রাধান্য নেই। তাই সংবিধানের রক্ষাকর্তা ও ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে আদালতের গুরুত্ব থাকে না বলে এরূপ ব্যবস্থায় আদালত খুবই দুর্বল প্রকৃতির হয়। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বিরোধের মীমাংসার কাজও আদালতকে এককেন্দ্রিক সরকারে করতে হয় না।

অপরদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতাবণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো বিরোধ দেখা দিলে আদালতকে সেই বিরোধ মেটানোর কাজ করতে হয়। তা ছাড়া আদালতকে আইনের ব্যাখ্যাকর্তা ও রক্ষাকর্তা হিসেবেও কাজ করতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষার কাজ করে। আবার আইনসভা যদি সংবিধানবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করে তাহলে যুক্তরাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষ কেন্দ্রীয় আদালত সেটিকে বাতিল করে দিতে পারে।

[6] **সংবিধানের সংখ্যা সংক্রান্ত পার্থক্য:** এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। কেন্দ্রীয় সরকার শাসনকার্যের প্রয়োজনে তাদের গঠন করলেও কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশমতো তাদের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। কাজেই এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় একটি মাত্র সংবিধানের অস্তিত্ব বিদ্যমান।

অপরদিকে, যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সংবিধানের অস্তিত্ব বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য একটি সংবিধান এবং প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের জন্য পৃথক সাংবিধানিক ব্যবস্থা বিদ্যমান।

[7] **নাগরিকত্বের প্রকৃতি সংক্রান্ত পার্থক্য:** এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় নাগরিককে কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিই আনুগত্য জানাতে হয় বলে এখানে এক-নাগরিকত্ব বিদ্যমান।

অপরদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দুই ধরনের সরকারের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকায় নাগরিককে দুই ধরনের সরকারের কাছে আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়। তাই এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় দ্বিনাগরিকত্ব গড়ে ওঠে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, যুক্তরাজ্য, গণপ্রজাতন্ত্রী চিন, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রে এক-নাগরিকত্ব বিদ্যমান। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিনাগরিকত্ব বিদ্যমান।

উপসংহার: এখানে আলোচিত এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পার্থক্যগুলি কেবল কাঠামোগত পার্থক্য, এই পার্থক্যগুলি মাত্রাগত পার্থক্য নয়।

প্রশ্ন 8 রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থার সংজ্ঞা দাও। রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো। 2+8

উত্তর

রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থা

রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থা হল এমন একটি ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ আইন বিভাগের প্রভাব থেকে মুক্ত। সংবিধান অনুযায়ী এরূপ ব্যবস্থার কার্যাবলি পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থায় ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতিটি প্রযুক্ত থাকায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তারা তাদের নিজ নিজ কাজ স্বাধীনভাবে করতে সক্ষম। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ফিলিপিনস প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান।

পতি-শাসিত শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থার এরূপ সংজ্ঞা থেকে এর যেসব উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তা হল—

[1] **রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক প্রধান:** রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন একাধারে আনুষ্ঠানিক প্রধান এবং রাজনৈতিক প্রধান। এরূপ ব্যবস্থায় নামসর্বস্ব কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের অস্তিত্ব নেই। রাষ্ট্রপতি হলেন এরূপ ব্যবস্থায় চূড়ান্তভাবে প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপ্রধানের নামেই দেশের সকল প্রকার শাসনকার্য পরিচালিত হয়। তিনি হলেন রাষ্ট্রের ও শাসন বিভাগের প্রধান।

[2] **রাষ্ট্রপ্রধানের নির্বাচন ও পদচ্যুতি:** রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন না। তিনি দেশের সংবিধান অনুযায়ী জনসাধারণ কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। এই কারণে তিনি তাঁর সম্পাদিত কার্যাবলির জন্য আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকেন না, তিনি দায়িত্বশীল থাকেন জনগণের কাছে।

আবার রাষ্ট্রপতিকে সাধারণভাবে আইনসভা অপসারণ করতে পারে না। তাঁকে অপসারণ করার জন্য অভিযুক্তকরণ পদ্ধতি (impeachment) কার্যকর করতে হয়। যে সমস্ত অপরাধে রাষ্ট্রপতিকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে তা হল—সংবিধানভঙ্গ, শাসনকার্য পরিচালনায় অক্ষমতা, দুর্নীতি বা দেশদ্রোহীতা। এইসব অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে নির্দিষ্ট কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই পদচ্যুত করা যায়। তাঁকে পদচ্যুত করার ব্যাপারে 'বিশেষ পদ্ধতি' অনুসরণ করতে হয়।

[3] **রাষ্ট্রপতি ও আইনসভা:** রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি আইনসভা ভেঙে দিতে পারেন না এবং আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তিনি কোনোরূপ নির্দেশও দিতে পারেন না। এইরূপ শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি ও আইনসভা একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি এবং কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ অর্থাৎ জনপ্রতিনিধি সভা একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে।

[4] **মন্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক:** রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে, এরূপ শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির সহকর্মী নন, তাঁরা রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী মাত্র। রাষ্ট্রপতি এই ধরনের ব্যবস্থায় ক্যাবিনেট গঠন করেন। ক্যাবিনেটের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতিকর্তৃক নিযুক্ত হন। কোনো মন্ত্রী রাষ্ট্রপতির বিরাগভাজন হলে সেই মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়। কাজেই রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের নিয়োগ ও পদচ্যুতি করাতে পারেন বলে তাঁদের সম্পাদিত কাজগুলির ব্যাপারে মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির কাছে দায়িত্বশীল থাকেন।

[5] **ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ:** রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ। ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণের নীতি অনুসারে এই ব্যবস্থায় আইন বিভাগ যেমন রাষ্ট্রপতির ওপর কোনোরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারেন না বা রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তেমনই অন্যদিকে রাষ্ট্রপতিও আইন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অর্থাৎ শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ পরস্পর পরস্পরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে তাদের নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে। তা ছাড়া এরূপ শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের ব্যাপারে শাসন বিভাগ সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে না। কাজেই রাষ্ট্রপতি ও তাঁর ক্যাবিনেটের সদস্যগণ আইনসভার অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে, প্রশ্ন বা জবাবদিহি করতে বা বিল উত্থাপন করতে পারেন না। অপরদিকে আইন বিভাগও শাসন বিভাগকে সরাসরি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে না বা তার বিরুদ্ধে কোনো অনাস্থা-প্রস্তাব আনতে পারে না।

উপসংহার: রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণই শ্রেয়। কারণ উদারনৈতিক দেশের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সবকটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশে এই বৈশিষ্ট্যসমূহের বেশিরভাগ পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন 9 মন্ত্রীপরিষদীয় সরকার কাকে বলে? এই সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো। 2+8

অথবা, সংসদীয় সরকার বলতে কী বোঝ? সংসদীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো। 2+8

অথবা, পার্লামেন্টীয় সরকার কাকে বলে? এই ধরনের সরকার বা শাসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? 2+8

উত্তর

মন্ত্রীপরিষদীয়/সংসদীয়/পার্লামেন্টীয় সরকার

যে শাসনব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে, মন্ত্রীপরিষদ প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী এবং শাসন বিভাগের কার্যকারিতা ও স্থায়িত্বকাল আইন বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এরূপ শাসনব্যবস্থাকে বলা হয় মন্ত্রীপরিষদীয় বা সংসদীয় শাসনব্যবস্থা। তবে বর্তমানে সংসদীয় ব্যবস্থায় আইনসভার পরিবর্তে ক্যাবিনেট তথা মন্ত্রীপরিষদের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। তাই অনেকে সংসদীয় শাসনব্যবস্থাকে মন্ত্রীপরিষদচালিত শাসনব্যবস্থা বা ক্যাবিনেট-শাসিত ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেন। এরূপ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা। এ ছাড়া জাপান, ভারত প্রভৃতি দেশেও মন্ত্রীপরিষদীয় শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান।

মন্ত্রীপরিষদীয়/সংসদীয়/পার্লামেন্টীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য

মন্ত্রীপরিষদীয় সরকারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

[1] **নামসর্বস্ব শাসকের অবস্থান:** সংসদীয় বা মন্ত্রীপরিষদীয় শাসনব্যবস্থায় একজন নামসর্বস্ব বা আনুষ্ঠানিক শাসক প্রধান থাকেন। তাঁর নামেই প্রশাসনিক যাবতীয় কাজ পরিচালিত হয়। আইনগত দিক থেকে তিনি দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু বাস্তবে মন্ত্রীপরিষদ বা ক্যাবিনেট নামসর্বস্ব শাসকের নামে দেশের সকল শাসনকার্য পরিচালনা করে।

[2] **ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতির অনস্তিত্ব:** ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতির অস্তিত্ব সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় দেখা যায় না। ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসারে সরকারের তিনটি বিভাগ পৃথক পৃথক ভাবে তাদের কার্য পরিচালনা করে। কিন্তু সংসদীয় ব্যবস্থায় আইন বিভাগের সঙ্গে শাসন বিভাগের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই দুটি বিভাগ একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে তাদের কার্য সম্পাদন করে। আবার একজন ব্যক্তি পাশাপাশি একাধিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থেকে কার্য সম্পাদন করে।

[3] **দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা:** মন্ত্রীপরিষদচালিত শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত শাসককে সংসদ বা আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয়। এই ব্যবস্থায় প্রকৃত শাসক যেহেতু আইনসভার সদস্য সেহেতু আইনসভার আস্থার ওপর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। আইনসভার আস্থা হারালে সরকারেরও পতন ঘটে। মন্ত্রীপরিষদের সদস্যরা তাদের সকল কাজের জন্য আইনসভার কাছে জবাবদিহি করেন। এই কারণে অনেকে সংসদীয় শাসনব্যবস্থাকে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা বলেও অভিহিত করেন।

[4] **রাজনৈতিক প্রধান:** সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের রাজনৈতিক প্রধান হলেন 'প্রধানমন্ত্রী' বা 'চ্যান্সেলার'। তিনি আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি সরকারের নেতৃত্ব দেন। মন্ত্রীপরিষদের মন্ত্রীদের নিয়োগের ব্যাপারে তিনি পরামর্শ দেন। আবার কোনো মন্ত্রীকে অপসারণের ব্যাপারেও তাঁর সুপারিশ প্রয়োজন। মন্ত্রীসভার সঙ্গে নামসর্বস্ব শাসকের যোগসূত্র হিসেবে তিনি কাজ করেন।

[5] **মন্ত্রীসভার যৌথ দায়িত্বশীলতা:** মন্ত্রীসভার যৌথ দায়িত্বশীলতা সংসদীয় শাসনব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি মন্ত্রী তাঁর নিজ নিজ কাজের জন্য যেমন আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল

পাশাপাশি সমগ্র মন্ত্রীসভা যৌথভাবে আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল। আইনসভা যদি কোনো মন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে তাহলে সমগ্র মন্ত্রীসভাকেই পদত্যাগ করতে হয়। এই কারণে আইভর জেনিংস বলেছেন যে, আইনসভা কর্তৃক কোনো মন্ত্রীর ওপর আক্রমণের অর্থ হল সরকারের ওপর আক্রমণ।

[6] **বিরোধী দলের ভূমিকা:** সংসদীয় শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব। বিরোধী দল একটি বা একাধিক হতে পারে। সাধারণ নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চা সরকার গঠন করে এবং যে দলটি বা দলগুলি সংখ্যালঘিষ্ঠ হিসেবে পরিগণিত হয় তারা বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। বিরোধী দলের অন্যতম কাজ হল জনকল্যাণের স্বার্থে সরকারের ভুলত্রুটিগুলির সমালোচনা করা। সরকার কোনোরূপ স্বৈরাচারী আচরণ করতে যাতে না পারে সেদিকে বিরোধী দল লক্ষ রাখে। এই কারণে সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দল হল গণতন্ত্রের প্রাণ। বার্কার বিরোধী দল সম্পর্কে বলেছেন যে, গণতন্ত্র হল এমন একটি দুই-চাকা বিশিষ্ট গাড়ি, যার একটি হল সরকার এবং অপরটি হল বিরোধী দল।

[7] **মন্ত্রীপরিষদ গঠন:** সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইনসভার নিম্নকক্ষ মন্ত্রীপরিষদ বা মন্ত্রীসভা গঠন করে। আইনসভার নিম্নকক্ষে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে অথবা যে মোর্চা সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়, সেই দলের বা মোর্চার নেতা বা নেত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বা চ্যান্সেলার হিসেবে নিয়োগ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থায় মন্ত্রীসভায় কে কে থাকবেন সে ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বা চ্যান্সেলার পরামর্শ দেন। নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধান প্রধানমন্ত্রীর সেই পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন।

উপসংহার: সংসদীয়ব্যবস্থা সকল দেশে একইরকম কাঠামো বা কার্যাবলিবিশিষ্ট হয় না। যে সকল দেশে এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বিদ্যমান তাদের সঙ্গে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা সমন্বিত সংসদীয় ব্যবস্থার পার্থক্য বিদ্যমান। কোনো কোনো আইনসভার সার্বভৌমিকতা বিদ্যমান। কোনো দেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা দুটি, আবার কোনো দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান।

প্রশ্ন 10 সংসদীয় শাসনব্যবস্থার গুণ ও ত্রুটিসমূহ আলোচনা করো।

অথবা, পার্লামেন্টীয় শাসনব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা করো।